KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

পুনর্বাসন যখন বিপর্যয়ের নামান্তর: প্রসঙ্গ দামোদর নদের উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল

দেবতী দে
অ্যাকাডেমিক রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, এডুস্ক্রাইব

সারসংক্ষেপ

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন বন্যা ঠেকাতে প্রথম বার নদীপাড়ে বাঁধ আবশ্যক হয়ে ওঠে। ক্রমে বিংশ শতক থেকে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশে কৌশলগত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে চলল নদীশাসন। তবে এই বিবিধ কার্যক্রমে অববাহিকা অঞ্চলে আর্থ- সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের পরিণাম কি হতে পারে ইহাই হল গবেষনা পত্রের বিষয়বস্তু। মনুষ্যস্বার্থের তাগিদে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যাবস্থার বিকাশের অছিলায় যখন বৃহৎ জলাধার নির্মাণ প্রকল্প শুরু হল, তার খেসারত দিতে হল একদল অসহায় উপজাতীয় মানুষদের। যার ফলে বিষিয়ে ওঠে নদী ও মানুষের মধ্যেকার আন্তরিক সম্পর্ক, ছিন্ন হয় মানুষের সঙ্গে নদীর ভালোবাসার বন্ধন। পাশাপাশি উচ্ছেদ এবং পুনর্বাসনের নির্মম দোলাচলের মধ্য দিয়ে জীবন জীবিকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। ফলে মানুষের পাওয়া না পাওয়ার ভিতর অন্তরায় থেকে গেল কতটা? এর দায়ভার নিতে সরকার কি আদেও সফল হয়েছিল!

সূচক শব্দ- উপজাতীয, সম্প্রদায়গুলি, দামোদর নদীর, গ্রামবাসীদের, বাস্তুচ্যুতদের

ভূমিকা

উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলি একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক স্থানকে কেন্দ্র করে নিজেদের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক বিন্যাস ও জীবিকা নির্বাহের ধারাবাহিকতা গড়ে তোলে। যা সম্পূর্ণ রূপে জল, জঙ্গল, জমিকে আঁকড়ে ধরে বেড়ে ওঠে। খনিজ সমৃদ্ধ বনাঞ্চল-প্রাকৃতিক সম্পদে আবিষ্ট এলাকায় উপজাতিদের অবাধ বিচরণ হল একটি সহজাত প্রবৃত্তি। ভারতে যত্র তত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে উপজাতি গোষ্ঠীগুলি যারা যুগ যুগ ধরে সযত্নে লালন করে আসছে নিজেদের আচার বিচারগুলি। কিন্ত ১৯শতকের শুরুতে দেখা যায় প্রচলিত সমাজ ব্যাবস্থা থেকে দূরে সরে থাকার প্রয়াস খুব বেশিদিন কার্যকর হয়নি। উপজাতী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে হাত পড়ে উপনিবেশকারীদের। উপনিবেশিকরনের দরুন জঙ্গলের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা সম্পর্কগুলো ক্রমশ এলোমেলো হয়ে যায় শিল্প বিপ্লবের ঘনঘটায়। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে পরস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে, দেশের আর্থিক উন্নয়নের কাঠামো রচনায় যখন তাদের বাসভূমি থেকে উন্নয়নে পুনর্বাসিত হতে হয়। বৃহত্তর উপজাতীয় সমাজের নিকট স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা ছিল কল্পনাতীত। কারণ এতে তাদের সামাজিক সংগঠন, সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত জীবিকা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, নাচ- গান ইত্যাদি চিরাচরিত উপকরণ গুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরবর্তী কোনো প্রচেষ্টাই পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। তাই উপজাতীয় ভাষায় "পুনর্বাসন" শব্দটি বিপর্যয়ের নামান্তর।[১]

গবেষণাপত্রে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত দামোদর নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলটি আলোচনার বিষয়বস্তু। অববাহিকার ভূতত্ত্ব আর্কিয়ান অধিযুগ থেকে সাম্প্রতিককালের নানান শিলা বিন্যাসের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। গ্রানাইট, গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা, চুনাপাথর, বেলেপাথর, এবং পলিমাটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ড শব্দটির আক্ষরিক অর্থ একটি স্থলবেষ্টিত বনাঞ্চল, যা ছোটোনাগপুর মালভূমি ও সাঁওতাল পরগনার বনভূমি নিয়ে গঠিত। রাজ্যের ভুমিরূপ বলতে মালভূমি ঘেরা পাহাড়, জঙ্গল, নদী অববাহিকার ঢালু উপত্যকায় প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির মধ্যে সযত্নে লালিত হয়েছে একাধিক উপজাতীয় গোষ্ঠী। গ্রীষ্ম কালীন আদ্র পর্ণমোচী জলবায়ুর উদ্ভিদ (শাল, শেগুন, মহুয়া, পলাশ) দ্বারা আচ্ছাদিত ঝোপঝাড় এবং লতাগুল্মর গৌণ বৃদ্ধি সহ সাভানা বনভূমি সৃষ্টি করেছে। দেশের ৪৬% কয়লা সঞ্চিত রয়েছে নদী গহ্বরে, তাই দামোদর কথার অর্থ দাম (আগুন) যার উদরে। এছাড়াও আকরিক লোহা, তামা, কয়ানাইট, অভ্র উৎপাদনে এগিয়ে রয়েছে। এখানে একাধিক প্রজাতির উদ্ভিদ- প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। দামোদর নদের জন্ম ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব মালভূমির খামারপাত পাহাড় (উচ্চতা ১০৬৮মি:)। নদীর দৈর্ঘ্য ৫৪১ কিলোমিটার এবং অববাহিকার আয়তন ২৫,৮২০ বর্গ কিলমিটার। প্রথমদিকে নাম ছিল দেওনদ যার অর্থ পবিত্র বা দা-মুন্ডা (মুন্ডাদের জল) বোঝায়। পার্বত্য রাজ্যটি দেশের তফসিলি উপজাতির প্রায় দশমাংশের আবাসস্থল। জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে হো, মুন্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। রাঁচি- ডালটনগঞ্জ রোডের উত্তরে যত নদীনালা নেমেছে পাহাড় থেকে, তার সবই উত্তর দিকে বয়ে গিয়ে দামোদরে পড়েছে। মুরির পশ্চিমে রাজাপ্পার বিখ্যাত ছিন্নমস্তার মন্দির ঘেঁষে প্রবাহিত হয়েছে দামোদর। ঝাড়খণ্ডের ভুজুডি ছাড়িয়ে দামোদরের সঙ্গে গোবাই নদীর সঙ্গম। মধুকুন্ডার কাছে দামোদর পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার উত্তর সীমানায় পৌঁছায়।[২]

দামোদর উপত্যকায় ভারতের প্রথম বহুমুখী পরিকল্পনা

মুক্ত ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠন করা হয়েছিল ১৯৩৮সালে। এরপর জাতীয় সরকার কর্তৃক দেশের সম্পদের সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে জাতীয় জীবনের সার্বিক অগ্রগতির প্রয়াস চালানো হয়। জলসম্পদের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সুপারিশগুলি সর্বপ্রথম ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া পার্লামেন্টে পেশ করা হয় ১৯৪৭ সালে (নভেম্বর-ডিসেম্বর অধিবেশনে)। যেখানে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রূপে স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী পরিকল্পনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল - কৃষির বিস্তার, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি উপজাতীয় এলাকার আধুনিকীকরণের সাথে শিল্পায়ন, সেচ সুবিধা, বিদ্যুৎ এবং সেবামূলক খাতে বিনিয়োগ করা যাতে, বাংলা এবং পূর্ববর্তী দক্ষিণ বিহার(বর্তমান ঝাড়খণ্ড) দুই রাজ্যে সার্বিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

ডি ভি সি-র নির্মাণকার্য চলেছিল সম্পূর্ণ উচ্চ অববাহিকা বরাবর (কেবলমাত্র দুর্গাপুর ব্যারেজ নিম্ন অববাহিকায়। ৪টি বাঁধের সরলচিত্র অঙ্কন করা হয়, তিলাইয়া, মাইথন, কোনার, পাঞ্চেত যথাক্রমে বরাকর, কোনার ও দামোদর নদীর উপর। বাঁধ প্রতিষ্ঠা হয় যথাক্রমে ১৯৫৩, ১৯৫৭, ১৯৫৫, এবং ১৯৫৯ সালে। আশা করা হয়েছিল এহেন পদক্ষেপ অববাহিকা অঞ্চল তথা দেশের মানুষের জীবন- জীবিকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। প্রাথমিকভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা আসে।

কিন্তু প্রাকৃতিক পরিসরে বাঁধ নির্মাণ নদীর উচ্চ অববাহিকায় কেবলমাত্র ভূমি ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন করেনি, সাথে জমির অবক্ষয় ঘটায়, ফলে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল অগণিত মানুষ, ধ্বংস হয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম। জলাধার পূর্ণ করা হলে শত হাজার বর্গ কলোমিটারের বিশাল এলাকা জলের নিচে তলিয়ে যায়। গ্রাস করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাড়িঘর, কৃষি জমি, গবাদি পশু, গ্রাম, গাছপালা, জঙ্গল, ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালে ডি ভি সি-র

নির্মাণকাজ শেষ হলে দেখা যায় প্রায় ৪১,০০০ একর জমি বেশিরভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছে। ঝাড়খণ্ড, ধানবাদ, জামতাড়া, পুরুলিয়া, পূর্ববর্তী বর্ধমান জেলায় (বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান) প্রায় ৯৩০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। জমি, বাড়ি, জীবিকা সর্বস্ব হারানো বাস্তুচ্যুতদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের নিদারুণ কুফল হিসেবে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা আরও বেশি। ভারতে বিশ্বের সবচাইতে বেশি সংখ্যক নদী প্রকল্পের বিশিষ্টতা রয়েছে আর সেই সঙ্গে উন্নয়নমূলক হাতছানির মধ্যে বাঁধ হল উচ্ছেদের অন্যতম বড় কারন। তাই সরকারি হোক বা বেসরকারি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উপর উন্নয়নের গুরুতর একটা প্রভাব লক্ষণীয়। দেশের বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় একপ্রকার জোরপূর্বক আদিবাসী সম্প্রদায়কে সমূলে উৎখাত করে বাজার অর্থনীতির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তারা একেবারেই অনভ্যস্ত ছিল। ফলে সমস্যাগুলি মোকাবিলায় অল্প সময়ের মধ্যে তাদের দাসত্বের পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

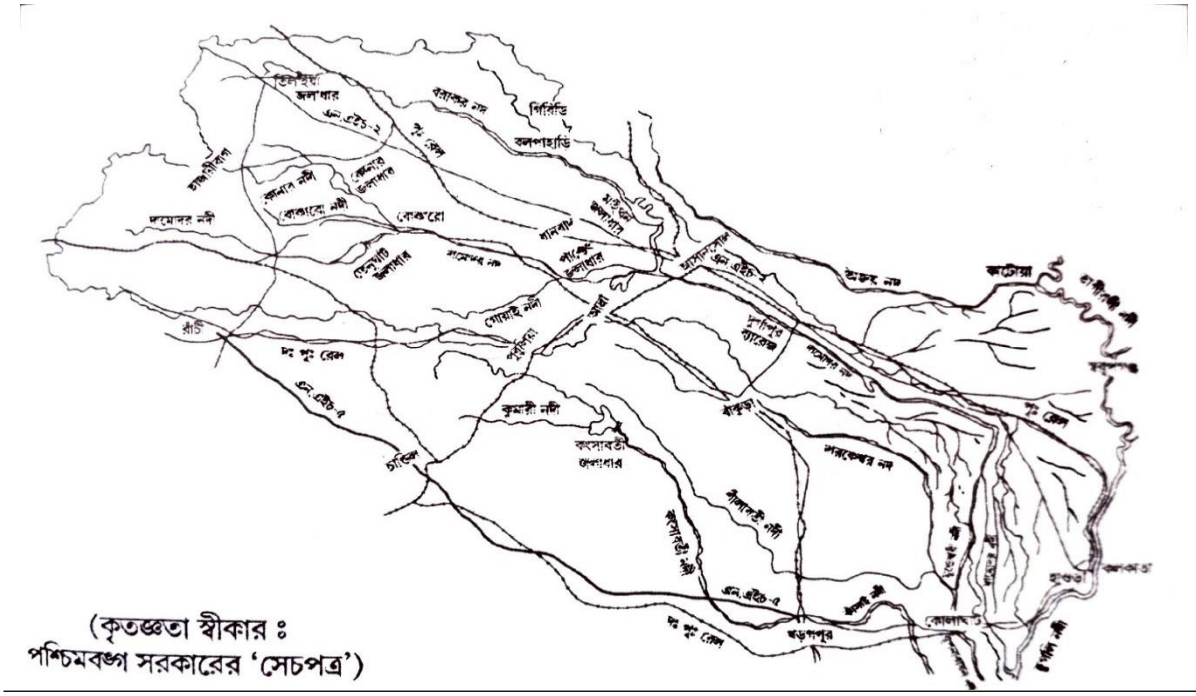

চিত্র ১। দামোদরের উপত্যকা অঞ্চলের নদনদী ও জলধারা

দামোদর উপত্যকায় উচ্ছেদ ও পুনর্বাসিত মানুষ এবং তাঁদের সমাহিত ইতিহাসের সন্ধানে

পুনর্বাসনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু উচ্ছেদ ও বাস্তুচ্যুতির চরম তীব্রতা সত্বেও ভারত এখনও একটি জাতীয় পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। বিপুল সংখ্যক প্রকল্পে পুনর্বাসনের অনিশ্চয়তা মানুষের দারিদ্রতা, প্রান্তিকীকরণের একটি প্রধান কারণ। এমনও দেখা যায় পুনর্বাসন কোনো কোনো পরিকল্পনার অংশই নয় কিংবা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার অনেক পরে পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়। এই শত হাজার মানুষ নিজেদের জীবন জীবিকা হারিয়ে ধ্বংসের সাক্ষ্য বহন করেছে, প্রায় এক দশকের বেশি সময় লেগেছে তাদের পুনর্বাসিত করতে। এই দীর্ঘ সময়কালীন স্তরে তাদের রোজগার, স্বাস্থ্য, সম্পদ নিয়ে প্রকল্পের ধ্বজাদারীরা লেশমাত্র চিন্তিত বোধ করেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ আইনটি পাট্টাধারীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রতীকী অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু ভূমিহীনরা বিকল্প কোনোরকম আর্থিক সাহায্য পায়নি। অনেকে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশের দিকে ধাবিত হয় নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সামান্য কিছু সমর্থন পাওয়ার আশায়। [৩]

উত্তর স্বাধীনতা পর্বে উন্নয়ন সমর্থিত প্রত্যেকটি বাঁধ প্রকল্পই দারিদ্রতার আখ্যান রচনা করেছে যার অমানবিক প্রক্রিয়া, ভয়ঙ্কর পরিণতি আর্থ সামাজিক অবক্ষয়ের দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পূর্বপুরুষের দীর্ঘকালের বসতভিটা, খামার, জল, জঙ্গলের অধিকার থেকে সমূলে উৎপাটন, ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা একটি উৎপাদন ব্যবস্থাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে ফেলা, মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে উপজাতীয় মানুষদের বিপর্যস্ত করে তোলে। গোষ্ঠী গুলির মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়, পরিবার প্রথার বিক্ষিপ্তকরণ ঘটে, নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমগুলির মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে ফলে সহজ সরল সম্পর্কের সমীকরণটি এলোমেলো হয়ে যায় গ্রামীণ জীবনধারায় অভিশাপ নেমে আসে।

ভারতে গত ৭০ বছরে ৫০ মিলিয়নেরও বেশি লোককে তাদের বাড়িঘর থেকে উৎখাত করা হয়েছে জলবিদ্যুৎ ও সেচ প্রকল্প, খনি (বিশেষ করে উন্মুক্ত খনি), সুপার-থার্মাল এবং পারমাণবিক-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প শহর ইত্যাদির মতো বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে সরকারের কাছে কোনো তথ্য নেই। বিশ্বব্যাংকের একটি পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানে নির্মিত প্রতিটি নতুন বড় বাঁধের কারণে গড়ে ১৩০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। এই অনুমান অনুসারে, ৩০০০ বড় বাঁধ দ্বারা বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৩৯ মিলিয়নেরও বেশি হবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিকস অফ ডিসপ্লেসমেন্ট সম্পর্কে একটি মর্মস্পর্শী মন্তব্যে অরুন্ধতী রায় বলেছেন, "যাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যারা সারা জীবন বনের গভীরে বাস করেছেন, যেখান থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, জ্বালানি, পশুখাদ্য, আঠা, তামাক, ঔষধি গাছ, আবাসন সামগ্রী সংগ্রহ করে থাকে- এর বিকল্প হিসেবে তারা একদা দৈনিক দশ- বিশ টাকা আয় করে যা দিয়ে কোনমতে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে।[৪] নদীর পরিবর্তে পেয়েছে হাত পাম্প, পুরনো প্রথায় তারা ছিল মুদ্রা অর্থনীতি থেকে দূরে, চাষবাস মার খেলে তাদের কাছে বনভূমি ছিল, মাছ ধরার জন্য নদী ছিল পশুসম্পদ ছিল স্থায়ী আমানত ইত্যাদি প্রাকৃতিক সমৃদ্ধতাই তাদের ঘিরে রেখেছিল যা ছাড়া তারা নিঃস্ব"।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে সুনিশ্চিত করা হয় যেসব অঞ্চল প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাবের তালিকাভুক্ত সেইসব স্থানে বসবাসকারী মানুষের সাথে পরামর্শ করা হবে এবং এমন ভাবে অবহিত করা হবে যাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও নিজেদের সর্বোত্তম ভাবে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু দেখা যায় বড় বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয়দের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, কোন গ্রামের কোন অংশ কখন অধিগ্রহণ হবে বা জলে নিমজ্জিত হবে সেই সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। ডি ভি সি-র ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতার রেকর্ড থেকে জানা যায় প্রায় ৫৫টি গ্রামের ৪০,০০০ ব্যক্তিকে জানানো হয়েছিল যে তারা বাস্তুচ্যুত হবে কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই জলাধার ভরাট করা হয় এবং ১১১ টি গ্রাম তলিয়ে যায়, ৯০,০০০ এর ওপর মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। এবিষয়ে আমলাতান্ত্রিক অলসতা ও সংবেদনশীলতার অভিযোগ ওঠে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য তাদের এই অজ্ঞানতার কারণ সরকারীভাবে বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে তাদের খুব কম তথ্য দেওয়া হয় যেসমস্ত আধিকারিকরা সাইট পরিদর্শনে আসে ও বন বিভাগের কর্মচারী, বনরক্ষীদের পারস্পরিক কথোপকথনের ফলে তারা সামান্য কিছু বিষয়ে অবগত হন কিন্তু তাদের আনুষ্ঠনিক ভাবে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। তাই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য প্রদানে সরকারের বিশেষ দায়িত্বটি ক্ষমার অযোগ্য। এমন রটনাও শোনা যায় যে তাদের ক্ষতিপূরণ নাকি কিস্তিতে দেওয়া হবে এবং যদি তারা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে চলে যায় তাহলে সেখানে জলের দরে জমি বিলি করা হবে।[৫]

পুনর্বাসন একটি সূক্ষ বিষয়। যার বাস্তবায়নের দিকে নজর রাখলে অতি সাবধানতার সঙ্গে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির আপেক্ষিকতা বিচার করা প্রয়োজন যেমন বিতাড়িতদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক স্তর এবং পরিবেশগত ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক গঠনের সঠিক পর্যালোচনা করে প্রত্যেকটি দিকের পুনর্বাসনের জন্য অধ্যয়ন আগে দরকার। প্রায়শই কর্তৃপক্ষ প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের পরিবর্তে তাদের দূরবর্তী স্থানে মাইগ্রেশনে বেশি আগ্রহী। তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পের সমর্থকরা প্রায়ই যুক্তি দেন যে, সাময়িকভাবে ঘরছাড়া

হয়েও ব্যক্তির আর্থিক আয়ের উন্নতি হওয়া সম্ভব। এই প্রস্তাবকে অস্বীকার করা হয়েছে (ফারনান্দেস, ২০১৯)। তিনি বলেছেন যে, দেশের ১৩ টি প্রকল্পের ৭০০ জনের সাক্ষাৎকারে আর্থিক আয় ৩০ শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে বেড়েছে বলে জানা গেছে। এমনকি কোথাও আর্থিক আয় বৃদ্ধি পেলেও, বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবনধারার অগত্যা কোন উন্নতি হয় না। যারা শুধুমাত্র আর্থিক আয়ের উন্নতির মাধ্যমে পরিবর্তন পরিমাপ করেন তারা প্রকৃত সত্যটি উপেক্ষা করে চলেন।

দামোদর উপত্যকায় উচ্ছেদিত নারী ও শিশু

গবেষণায় কার্যকরভাবে দেখা গেছে কিভাবে নারী ও শিশুরা উচ্ছেদের ফলে পুরুষদের তুলনায় বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে কারণ বাঁধের কুফল তাদের উপর মারাত্মক। বাস্তুচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ দুর্বলতাগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে, যেমন জীবিকার ঐতিহ্যবাহী উৎসগুলি জমি, বন, সাগর, নদী, চারণভূমি, গবাদি পশু বা লবণাক্ত জমি- শ্রমবাজারে নারীকে প্রান্তিক করে তোলে। ভূমি ও অন্যান্য উৎস প্রতিস্থাপন করা হলেই নারীরা অন্তত আংশিকভাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরে পায়। নারীরা শুধু স্বাস্থ্যগত ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি, তাদের সন্তানদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ প্রদানের বিষয়েও অক্ষম থেকেছে। অভিবাসন অবলম্বন করে তারা অজান্তেই নিজেদের সন্তানদের স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিশু কল্যাণমূলক পরিষেবাগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এই সমস্ত নীতিগুলির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল যে মহিলাদের পৃথক সত্তাকে উত্তরাধিকার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যেমন একজন বিধবা, অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে পুরুষ সদস্যের (ছেলে বা স্বামী) উপর নির্ভরশীল বলেই গণ্য করা হয়। কিছু ব্যাতিক্রমি উদাহরণ যেমন গুজরাট সরকার 1980 সালের পরে বিধবা হওয়া মহিলাদের স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মহারাষ্ট্র থেকে উদবাস্তুদের জন্য নীতি স্পষ্টভাবে বলে যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা কোনও জমির অধিকারী হবেন না। একই সুরে মধ্যপ্রদেশ নীতি নীরব। উত্তরপ্রদেশ নীতিটি আরও বেশি লিঙ্গ পক্ষপাতমূলক। শুধুমাত্র আদালতের মাধ্যমে তিনি তার স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি করতে পারেন আলাদা করে কোনো সম্পত্তির অধিকারী হবেন না। তিন সন্তান সহ একজন অসহায় মহিলা, যাকে তেহরি প্রকল্পের দ্বারা বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল, তার স্বামীর দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থের দাবির জন্য সংশোধনী আইন 1984-এর অধীনে আদালতে গিয়েছিলেন।[৬]

ক্ষতিপূরণ অবমূল্যায়ন

বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য একমাত্র ক্ষতিপূরণ হল জমি, বাড়ি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য নিশ্চিতরূপে আর্থিক ভরপাই। যে সরকারি স্বার্থের বেদীতে তারা বলি হল, প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে উক্ত স্থানে দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্ত ক্ষতিপূরণ বিতরণে ব্যাপক দূর্নীতি হয়েছে যেমন মোটামুটি শর্তে ধনী কৃষকরা বাড়ি কিংবা জমি হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ে সক্ষম হয়েছে কিন্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণী, আদিবাসী সমাজ হারানো সম্পত্তির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পায়নি।[৭] ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায়, চাষযোগ্য জমিগুলির কাগুজে অধিকার না থাকা, বাজার অর্থনীতিতে নগদ লেনদেন পরিচালনা করার অক্ষমতা, জঙ্গলের বাইরে এমন বিচিত্র জীবিকার জন্য অযোগ্যতা, এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও আদালতে দখলদারিত্বের আলোচনার ক্ষমতা নেই বললেই চলে ফলত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সরবরাহ করা যেকোনো সুবিধা অনপোজাতিদের থেকে উপজাতীয়রা তুলনামূলক ভাবে কমই আদায় করতে পেরেছে, আনুপাতিকভাবে প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে কম। মাসিক আয়ের ৪০ শতাংশের পতন ঘটছে, প্রাক-স্থানান্তর সময়ের তুলনায় ঋণের বোঝা স্থানান্তর-পরবর্তী সময়ে বহুগুণ বেড়েছে বলে দেখা গেছে। উচ্ছেদ, পুনর্বাসন গণনা সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। তাই কিছু মুষ্টিমেয় ছাড়া সিংহভাগ মানুষ ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। ক্ষতিপূরণের মুল্যাঙ্ক পরিচালিত হওয়ার পিছনে কিছু সমস্যা ছিল-

১। চলতি বাজার দরে বিগত তিন থেকে পাঁচ বছরের গড় হিসেবে একই অবস্থানের ও উন্নত মানের কৃষি জমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ভারতের জমির বেশিরভাগ লেনদেন নিবন্ধীকরনের খরচা এড়াতে অনৈতিকভাবে করানো। তাই 'Land of acquisition' আইন অনুযায়ী বাজার মূল্য এবং জমির নিবন্ধিত দামের মধ্যে ব্যবধান কমানোই কেবল সমাধান ছিল না। আবার তফসিলি অঞ্চলের জমি বিবাদ জটিল আকার নিয়েছিল যখন অনপোজাতিদের কাছে উপজাতিদের জমি বিক্রি রদ করে দেওয়া হয়েছিল। এক একটি চাষী পরিবার বাজার মূল্যের হারের চেয়ে ৩০ শতাংশ কম মূল্যে জমি নিতে বাধ্য হয়।

২। এবার প্রতিস্থাপন মূল্যের পরিবর্তে কথিত বাজার মূল্যে জমি এবং বাড়ি গুলির জন্য অর্থ প্রদান শুরু হয়। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি দেখতে পেয়েছে যে এক একর শুকনো জমির প্রতিস্থাপন মূল্য ছিল ৫০০০ টাকা এবং উর্বর চাষযোগ্য জমির হিসেব ১৩,৮০০ টাকা কিন্তু আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ ছিল যথাক্রমে ৯৩২ টাকা ও ২,৩৩২ টাকা। মোট হিসেবে যা ৫ গুন কম ছিল। এই সুযোগে বহিরাগতরা জায়গা খুব সহজেই দখল নিতে প্রস্তুত ছিল। রিপোর্টে কমিটির বাড়িগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের পরিমাণেও একই রকম হেরফের খুঁজে পাওয়া যায়। একটি পাথরের ঘরের নির্ধারিত মুল্য ১১,৫৬৪ টাকা কুঁড়েঘর ২৫০০ টাকা সেখানে সরকার কর্তৃক প্রেরিত মূল্য ছিল যথাক্রমে ৫,৫৬১ টাকা এবং ৬৪৫ টাকা যা ছিল গ্রামবাসীদের দাবির আনুমানিক এক তৃতীয়াংশ।

৩। ক্ষতিপূরণ শুধুমাত্র অবিসংবাদিত আইনি হলফনামা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সীমিত। কিন্তু জমির হিসাব রক্ষক বা পট্টয়ারী প্রবল দূর্নীতিপরায়ন হওয়ায় সঠিক তথ্য না রাখায় গরীব আদিবাসী মানুষ নিজেদের জমির মালিক প্রমাণে ব্যর্থ হয় ফলে ক্ষতিপূরণ পেতে জটিলতা দেখা দেয়।

৪। ভূমিহীন, ভাগচাষী, দিন মজুর, শ্রমিক-কারিগরদের ক্ষতিপূরণের আওতার বাইরে রাখা হয় যেহুতু কোনো জমিতে আইনগত মালিকানা তাদের ছিল না। তাই তারা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে বলে বিবেচনাই করা হয়নি।

৫। চারণভূমি এবং বনসম্পদের উপর নির্ভরশীল মানুষকে LAA এর অধীনে ব্রাত্য করেই রাখা হয়।

৬। LAA এ নিয়ম অনুযায়ী জমির মূল্য বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুসারে গণনা করা হয় বলে সুদের হিসেবে গরমিল থাকে।

৭। ক্ষতিপূরণের ঘাটতির হারকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত বৌদ্ধিক বা আর্থিক সচ্ছলতা কোনোটাই ছিল না নিরক্ষর, অসহায় উপজাতীয় মানুষগুলির। সরকারি উপরতলার মানুষ আইনের সাহায্য নিয়ে তাদের লভ্যাংশে কাটতি করে এবং কয়েকজন দাবীদার প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করায় আদালতে তাদের মামলাই মঞ্জুর করা হয়নি।

নগদ ক্ষতিপূরণ পরিচালনায় অক্ষমতায়

উচ্ছেদ হওয়া মানুষের পাওনা সম্পূর্ণটাই ছিল নগদ টাকা মারফত লেনদেন। এবারে গ্রামীন মানুষের নগদ পরিচালনার অভিজ্ঞতা কম হওয়ায় ফের আরেকবার আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হয়। দেখা যায় স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতারণার মাধ্যমে কিংবা পুরনো ঋণ শোধ করতে বেশিরভাগ পুঁজি শেষ হয়ে যায় কখনো বা নেশায় আসক্ত হয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। অর্থপ্রদানে বিলম্ব, অনিশ্চয়তা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ে বিড়ম্বনা বাস্তুচ্যুতদের জীবন অসাড় করে তোলে।[৮]

বিকল্প চাষযোগ্য জমি অধিগ্রহণে ব্যর্থতা

স্বাভাবিক ভাবেই হাজার হাজার হেক্টর জমি যদি জলের অতলে নিমজ্জিত হয় তাহলে সেখানে বসবাসকারী বিপুল জন স্রোতের চাপ সামলানোর মত ক্ষমতা বা সামর্থ্য কোনোটাই শাসকদলের থেকে না। অযথা জমির উপর চাপ বাড়ে। দৈনিক নূন্যতম খাওয়া পড়ার সম্বলটুকু জোগাড় করতে বিকল্প চাষযোগ্য জমির যোগান সরকার করতে ব্যর্থ হয়। বিতাড়িতদের জন্য গড় জমির আয়তন ৫৩-৬৩ শতাংশ হারে হ্রাস পায়। এর থেকে উপজাতিদের অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এহেন পরিস্থতিতে দুটি বিকল্পই খোলা থাকে এক দল কৃষিকাজ ছেড়ে একদল শহরে কাজের খোঁজে চলে যায় অন্য ভাগটি পার্শ্ববর্তী পরিত্যক্ত অঞ্চল পরিষ্কার করে চাষবাসের ব্যবস্থা করে কোনোরকম মাথাগোঁজার মত ঠাই করে নেয়।[৯]

একাধিকবার স্থানচ্যুতির ঘটনা

আশ্চর্যজনকভাবে বাঁধের কারণে যারা একবার স্থানান্তরিত হল কিছু লোক কাজের প্রয়োজনে পূর্ব দিকে ধাবিত হয় খনি অঞ্চলের দিকে, সেখানে বসতি গড়ে। অতঃপর আসানসোল ও সংশ্লিষ্ট এলাকার মাটির নিচে কয়লা খনির প্রসার, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য কমপক্ষে দু-তিনবার বাস্তুচ্যুতির আশঙ্কা দেখা যায়। ক্রমে তারা আরও নিঃস্ব হয়ে যায়। প্রথমবার বাঁধ নির্মাণকারী প্রকৌশলীদের খামখেয়ালীর শিকার এবং দ্বিতীয়বার আকস্মিক খনি খননে শেষ নিরাপত্তা টুকু হারানো ছিল অকল্পনীয়। কারণ দ্বিতীয় ঘটনার জন্য কোনোরকম ক্ষতিপূরণ তারা পায়নি। নিজেদের পুনঃস্থাপনের শেষ পুঁজিও লেগে যায় বিকল্প আশ্রয় জোগাড় করার কাজে। এভাবে নিষ্পাপ জনমানসে জোরপূর্বক অপসারণ নিঃসন্দেহে অপরাধ। এভাবে রাষ্ট্রের তরফে আমলাতান্ত্রিক সংবেদনশীলতার নির্মমতা, পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয়ের অভাব, এবং প্রান্তীয় মানুষের সরলতার সুযোগে তাদের জীবন অনিশ্চিত করে তোলে।

বিকল্প জীবিকা প্রদানে ব্যর্থতা

বিকল্প জীবিকা বলতে পোল্ট্রি ফার্ম ও মাছ চাষের একটা বড় ভূমিকা থাকে। অনুরূপ ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অভাবে মাছের ফলন দ্রুত হ্রাস পায়। মুরগি খামারে টাকা বিনিয়োগ করা হয় কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে পাখিরা হঠাৎ কোনো অসুস্থতায় মারা যায়। ভবনগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়। ফলে বাঁধের জলে মাছ ধরার বিষয়টি খোলা বাজারে নিলাম করা হয়। সেখানেও বিতাড়িতদের প্রতি একরকম নৃশংসতা দেখা যায়। মাছ ধরার ঠিকাদারেরা মৎস্য বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে লিজ আদায় করে এবং গ্রামের বাসিন্দাদের এই লোভনীয় ব্যবসা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যেখানে উচিত ছিল সমবায় ফিশিং এর হাল ধরে রাখা।১০

উপসংহারঃ-

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারি শিল্পের বিস্তার এবং আধুনিকতার মোড়কে পরিবেশিত হয় বৃহৎ প্রকল্পগুলি। যার অঙ্গীকার হিসেবে সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে সবচেয়ে বেশি মুল্য চুকিয়েছে সমাজের দুর্বল অংশগুলি যেমন দরিদ্র মানুষ, উপজাতীয় গোষ্ঠী, বিপন্ন হয়েছে তাদের জীবন। দারিদ্রতা দূরীকরণ, বেকারত্ব হ্রাস, খাদ্য সুরক্ষার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শুরু হলেও সরকারি ফল লাভে অসম বণ্টনে তারাই তীব্র বৈষম্যের শিকার হয়। বাস্তুচ্যুত উপজাতীয়দের সিংহভাগের ক্রমবর্ধমান সম্পদহ্রাস, উত্তরোত্তর ঋণের বোঝা বৃদ্ধি প্রভৃতি সমূহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং জীবন সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। 'এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া' যা একটি এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লিয়ারেন্স মেকানিজমের অধীনে এটিই একমাত্র অধ্যয়ন যার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব মূল্যায়নের একটি বাধ্যতামূলক উপাদান রয়েছে। যে কোনো রকমের অপ্রাকৃতিক নির্মাণকার্য চালানোর বিষয়ে আলোচনা হওয়া

দরকার। সরকারের মনোভাব রাজনৈতিক স্বার্থ উপেক্ষা করে মানুষের স্বার্থে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। কেবল মাত্র জাতীয় নির্দেশিকা দ্বারা ত্রাসের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয়দের দাবি উপেক্ষা করে কোনো নদী নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় যে বিতর্ক, কলহ, ও শেষে সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে তার উদাহরণ কম নেই। কৃৎকৌশলগত সম্ভবনা ও আর্থিক মূল্যায়নের নিরিখে সমান সম্পদ বন্টনের সুরাহা হবে না বরং নতুন এলাকায় সমস্যা ছড়িয়ে পড়বে। ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি রাজ্যের নিরিখেও যথেষ্ট ভিন্ন। তাই নদী চরিত্রকে বুঝে পরিবেশের সুস্থায়ী উন্নয়নই আজ প্রয়োজন(Sustainable Development)।

'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডকুমেন্টস', যা নয়াদিল্লীতে জনস্বার্থ ভিত্তিক একপ্রকার অ্যাডভোকেসি সংস্থার রিপোর্ট। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে কোনরকম অসঙ্গতি দেখলে এরা জনসাধারনের হয়ে তাঁবেদারি করে কাজ স্থগিত করে রাখতে পারে। নতুবা স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশকের মধ্যে শেষ হওয়া প্রকল্পগুলির পুনর্বাসন বিষয়ে অবহেলার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উড়িষ্যার রেঙ্গালি বাঁধ এলাকার প্রায় ১২০০০ বিরাঞ্চি পরিবারের দুর্দশা, হীরাকুঁদ থেকে বিতাড়িতরা, যারা পুনর্বাসন পরিকল্পনার অভাবে এলাকায় যতটুকু ফাঁকা জমি পায় তা দখল করে নেয়। এই জমিগুলি এখনও আইনত তাদের নয়, এবং বন কর্মকর্তাদের দ্বারা এই জমিগুলি খালি করার জন্য অবিরাম হেনস্তা করা হয়। একইভাবে কৃষ্ণা সেচ প্রকল্পের ব্যর্থতাকে স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করেছে কর্ণাটক সরকার, যার কোনো সরকারী পুনর্বাসন নীতি ছিল না, ন্যূনতম বিধানের মাধ্যমে লোকেদের পুনর্বাসিত করেছিল। স্থানচ্যুতি সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল। দলিত এবং অন্যান্য নিম্ন-বর্ণের গোষ্ঠী যারা মূলত ভূমিহীন ছিল বা খুব কম জমির মালিক ছিল, তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সম্পদের অভাবে তারা জমি কিনতে পারেনি, অবশেষে অভিবাসী শ্রমিকদের দলে নাম লিখিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রধানত জনগণের আন্দোলনের প্রভাবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাগুলি পুনর্বাসনের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছে - যা উদবাস্তুদের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রসারিত প্রচেষ্টা বলা চলে। রাষ্ট্র বা রাজ্যের অধীনে যে আইনই বলবৎ হোক না কেন মানব সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা আবশ্যক।

তথ্যসুত্র-

১। কপিল ভট্টাচার্য "বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা", ২/১/E ইডেন সেন্টার, আরামবাগ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, অন্যরকম ওয়েব সার্ভিসেস লিঃ, ২০০০, পৃঃ ১০৫-১৫২।

২। কল্যাণ রুদ্র "রিভার্স অভ দি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা ডেল্টাঃ এ ফ্লাইউভিয়াল আকাউন্ট অভ বেঙ্গল", Gewerbestrasse ১১, ৬৩৩০ Cham, সুইজারল্যান্ড, স্প্রিঞ্জার প্রকাশনী, ISBN ৯৭৮-৩-৩১৯-৭৬৫৪৪-০ (ই- বুক), ২০১৮, পৃঃ৪৯-৭০, ৭৭-৯২,১৩৭-১৬১।

৩। গোপিকান্ত কোনার "বর্ধমান সমগ্র", ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩, পরিবেশক দে বুক স্টোর, ২০০০, পৃঃ২৭৯-৩১৪, ১-২৪,১১৪-১৪৮।

৪। রঞ্জন চক্রবর্তী "সিচুএটিং এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রি", ৪৭৫৩/২৩, আনসারি রোড, দারিয়াগঞ্জ, নিউ দিল্লী-১১০০০২, মনোহর প্রকাশনী, ২০০৪, পৃঃ ৪-৩৫, ৬৫-৯০,১০৮-১৪৪,২৬৫-২৮৮।

৫। সুমিত গুহ "এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এথনিসিটি ইন ইন্ডিয়া- ১২০০-১৯৯১", রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার রোড, ব্লক সি বাঘাযতীন কলোনি, কলকাতা ৭০০০১৩, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯, পৃঃ ৩০-৫৫,২৬৮-৩৬৬।

৬। ওয়াল্টার ফারনান্দেস "ডিস্প্লেস্মেন্ট অ্যান্ড মার্জিনালাইজেশন ইন অন্ধ্র প্রদেশ অ্যান্ড তেলেঙ্গনা ১৯৫১-২০১০", প্রথম খণ্ড,জাগৃতি জিএমসিএইচ হস্টেল রোড অরুনোদই পাথ, খ্রিস্টান বস্তি, গোয়াহাটি আসাম ৭৮১০০৫, নর্থ ইস্টার্ন সোশ্যাল রিসার্চ সেন্টার, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃঃ ১২৫-১৯৫।

৭। (https://www.academia.edu/4324358/Displacement_Rehabilitation_and_Reparation_Dams_in_India?sm=b) (জুলাই ১৯৯৯)

৮।(https://www.academia.edu/9083402/Development_Induced_Development_Induced_Development_Induced_Development_Induced_Displacement_in_India_Displacement_in_India_Displacement_in_India_Displacement_in_India?sm=b) (জুলাই, ২০০০)

৯।(https://www.researchgate.net/publication/268367664_Large_Dams_and_Changes_in_an_Agrarian_Society_Gendering_the_Impacts_of_Damodar_Valley_Corporation_in_Eastern_India) (২০১২)

১০।(https://www.academia.edu/8072379/Damodar_River_Basin_Economic_Development_and_Nature?sm=b) (২০১২).